পূর্ব থেকে পশ্চিম

পর্বঃ ৪

‘দোহা’ শহরের মাঝেই ‘ন্যাশনাল’ এলাকার দিকে যাচ্ছে আমাদের গাড়ী। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে আমি ফিরে যাই অতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে। জন্মের পর একটু বড় হয়েই শিশু খুঁজে ফেরে তার আপনজন, চিনতে শেখে কে তার বাবা কে তার মা। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মা পাখির ছানার মত আগলে রেখে বড় করলেও, ছোটবেলায় বাবাকে খুঁজে পাইনি কোথাও। বাবা তখন দেশের বাইরে। খুব কম বয়সেই বেরিয়ে পড়েছিলেন সমুদ্র যাত্রায়। বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছেন গল্পের ঝুলি। জীবনের বড় একটা সময় কাটিয়েছেন ইউএস, ইউকে এবং এই দোহা শহরে। কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেই সবাই ‘ডারউইন’ হয়ে ফিরে আসে না। তাই সৌভাগ্য কিংবা দূর্ভাগ্যক্রমে আমার বাবার গল্প বিশ্বজুড়ে বলে বেড়ানোর দরকার হয়নি। সে-গল্পের শ্রোতা হতে হয়েছে শুধু মাত্র আমার মা আর আমাদের ভাই-বোনদেরকে। সেই-সে গল্পে বারবার এসেছে ‘ন্যাশনাল’ এলাকার কথা। এতবার এসেছে যে, মনে হচ্ছিলো, ‘ন্যাশনাল’! এ-যে আমার তীর্থস্থান, আমার পূর্বপুরুষের স্মৃতির মিনার। প্রথম পা রাখতেই মনে হলো, ‘একদিন কি আমারই পূর্বপুরুষের পদচারণায় মুখরিত হয়নি এই ভূমি? তারই পদচিহ্নের উপরই কি পড়ছে না আমার পদচিহ্ন?’ কিন্তু পৃথিবী কখনো সে-হিসেব রাখেনা; রাখাবার প্রয়োজনও হয়না। জানিনা, একদিন আমার কোন উত্তরপুরুষও হয়তো আসতে পারে এখানে, এই ভূমিতে, আমার মত করে। সেদিনো পৃথিবী তার হিসেব রাখবেনা, বলবেনা তার কাছে আমার কথা। কতজন আসে পৃথিবীর বুকে, কতজন চলে যায়; রেখে যায় শুধুই ইতিহাস।

একটা এলাকায় এত মানুষ যে বাংলাদেশের হতে পারে সেটা কল্পনাও করা যায় না। আমাকে দেখে তারা এত খুশি যে, সবাই তাদের কাজের বর্ণনা দিতে শুরু করলো। আমিও খুব আগ্রহ নিয়েই শুনছি। কিছুক্ষণ পর আরো নতুন কেউ আসে। তাদের মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়। তারা আগ্রহ করে নিজেদের কথা বলে, দেশের কথা বলে, জানতে চায়। এমন না যে, তারা শুধু আমাকে দেখেই খুশী; দেশের যে-কোন মানুষজনকে দেখলেই খুশীতে ভরে উঠে। গল্প করে, দেশের কথা জানতে চায়। এ-এক অন্য রকম অনুভূতি। কেউ শাক কিনছে, কেউ মুরগী নিয়ে বাসায় ফিরছে। আমাকে সবাই দাম বলছে, আবার ঢাকার বাজারের সাথে তুলনা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে কোনটার দাম এখানে বেশী, কোনটার দাম কম।

এরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু বাংলাভাষায় এই ‘সাধারণ’ শব্দটা ব্যবহার করা হয় ‘অসাধারণ’ সব মানুষজনদের বোঝাতে। এরা সবাই ‘অসাধারণ’ মানুষ। ‘ভদ্ররনোক’দের সাথে চলতে চলতে যে-জীবনের প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো, এইসব সাধারণদের সাথে কথা বলে বলেই একদিন আমি আবার সে-জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি তন্ময় হয়ে শুনি, কি এক আশ্চর্য সুন্দর আগ্রহ নিয়ে তারা আমাকে বুঝিয়ে বলে, তাদের

ভাবনার কথা, চিন্তার কথা, পরিকল্পনার কথা, ভবিষ্যতের কথা। আমি জিজ্ঞেস করি, ‘বছর শেষে টাকাতো বেশি জমাতে পারেন না, তাহলে প্লেনের টিকিট কেটে দেশে যান কি করে?’ কি অনিন্দ্য এক গাল হাসি হেসে তারা কয়েকজন একসাথে বলে উঠে, ‘বছরে একবার প্লেনের টিকিটতো কোম্পানী থেকে দেয়া হয়।’ অনেক অপ্রাপ্তির মধ্যেও এ-যেন তাদের বিরাট প্রাপ্তি, বিশাল সুখের কারণ। তারা বলে, কেন এবং কেমন করে অন্য আর সবার থেকে মালিক তাঁদের একটু বেশীই পছন্দ করে; কেমন করে তাঁরা মালিকের মন জয় করেছে সে-গল্প। কিন্তু যে জিনিস তারা খেয়াল করে উঠতে পারে না, মালিক হয়তো একে একে সবাইকে বলে রেখেছে যে একমাত্র তাকেই মালিক পছন্দ করে। মালিকের সেই কারসাজি বুঝবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। আর হয়তো সেটা নেই বলেই তারা সুখী হতে পারে, তারা খুশী হতে পারে। হাতে বেশি সময় না থাকায় সেদিনের মত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা করতে হলো ডিনারের উদ্দেশ্যে।

ডিনারের উদ্দেশ্যে যেখানে গেলাম, সেখানে আগ থেকে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন। তার মধ্যে যিনি সব কিছু ম্যানেজ করছেন, সেই ভদ্রলোকের বাড়ী কুমিল্লায়। উনার সাথে আছেন উনার স্ত্রী-পাকিস্তানী ভদ্রমহিলা এবং ফুলের মত ফুটফুটে ছোট দুটো মেয়ে ‘কায়নাথ’ আর ‘ফারাহানা’। এই ভদ্রলোককে আমার খুব পছন্দ হয়েছে অন্যরকম এক কারণে। উনি দোহায় প্রথম এসেছিলেন ক্রিকেট খেলবার জন্য অনেক দিন আগে, কিছুটা নাটকীয়ভাবেই। আসবেন-না, আসবেন-না করেও অনেকটা বাধ্য হয়েই এসেছিলেন। অথচ এখন তিনি কাতারের নাম করা একটা কোম্পানীর চীফ্ একাউন্টেন্ট। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ৪০ ভাগ সময় ক্রিকেট খেলে, ৪০ ভাগ সময় এদিক-সেদিক এই-সেই করে কাটিয়েছি, আর বাকী ২০ ভাগ সময় পড়ালেখা করে নষ্ট করেছি। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটের প্রতি প্রীতি থেকেই একজন প্রাক্তন ক্রিকেটারকে দেখে আমার একটু বেশিই পছন্দ হয়ে গেলো। তাছাড়া ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি, অমায়িক ধরণের। রেস্টুরেন্টের নাম ‘ক্যারাভান’। প্রথমে অন্য আরেকটা রেস্টুরেন্ট ঠিক করা ছিল, কিন্তু সেখানকার খাবার মুখে তোলা যায়না ব’লে অবশেষে ‘ক্যারাভান’ই নির্বাচিত করা হল। ‘ক্যারাভান’এর খাবার অবশ্য মুখে তোলা যায় এবং সে-পর্যন্তই। কেউতো আর বলেনি যে ‘ক্যারাভান’এর খাবার গিলতে পারা যায়, সবাই বলেছে মুখে তোলা যায়। অন্যদিকে আরব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সবাই আমাকে দেখিয়ে বলল, এটা হলো ‘এরাবিয়ান মোজবুশ’ বা এ-জাতীয় কিছু একটা নাম। একটা আস্ত ‘বকরী’ রান্না করে ডিশের মধ্যে বসিয়ে রেখেছে। তারপর সবাই তার থেকে মাংস ছিঁড়ে এনে খাচ্ছে। কেমন জানি মনে হলো ‘ন্যশনাল জিওগ্রাফীক’ চ্যানেলে দেখানো ‘হায়েনা’দের মাংস খাবার মত, আমার আর ছুঁয়ে দেখাই হয়নি। তবে মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারগুলো প্রশংসনীয় রকমের সুস্বাদু ছিলো, অন্যদিকে মুরগীতো চিরজীবন মুরগীই, সেটার স্বাদ কেউ চাইলেও কতটুকুই আর পরিবর্তন করতে পারবে। ডিনার শেষে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথারীতি হোটেলে ফিরে যাবার পালা; খুব সকালে উঠে আমাকে ফ্লাইট ধরতে হবে।

হোটেলে ফিরে আমি আলো ঝলমলে রাতের ‘দোহা’র দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এই পৃথিবীর বুকে কত শহরই না তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ তৈরী করেছে এক-এক রকমের শহর এক-একটা জায়গায়। জীবনের শত সহস্র দিনের মাঝে কেমন করে একটা দিন চলে গেলো এই অচেনা-অজানা এক শহরে; শহরটা জানতেও পারলোনা, একদিনের এক অতিথি কত কি ভাবছে তাকে নিয়ে, কতভাবে দেখছে তাকে। ‘আরবকন্যা’ দোহার প্রথম রাতটাকে, কে জানে হয়তোবা শেষ রাতও, বিদায় জানিয়ে আমি চলে গেলাম বিছানায়; শুভরাত্রি ‘দোহা’!!

সকালে দোহা এয়ারপোর্টের ইমিগ্রাশানে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি পাগড়ি পরা এক কাতারী লাইনের কোন তোয়াক্কা না করে, কাউন্টারে কাগজপত্র দিতে এগিয়ে গেলো। সাথে চার-চারটা ব্যাপক সুন্দরী রমনী। ব্যাপক কিনা আসলে বুঝা গেলোনা, শুধুমাত্র ধারণা করা গেল। কারণ, রমনীকূল আগা-গোড়া নিজেদেরকে কালো বোরাখায় ঢেকে রেখেছে। চোখগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। চোখগুলো যেহেতু দেখা যাচ্ছে, না দেখে আর উপায় কি। তা-দেখেই ধারণা করতে হলো এরা ব্যাপক রূপসী। সম্ভবত এরা চারজন সামনের কাতারী লোকটার চার-বউ। মুসলিম সমাজে এক আর চার হলে সবার আগে কেন জানি এ-জিনিসটাই মনে হয়। ইমিগ্রেশানের লোকজন কাতারীয় লোকটাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চার সম্ভবতবউসহকারে ভিতরে পাঠিয়ে দিলো। কে-জানে, হয়তো কোন এক শেখের বহুদূর সম্পর্কের কোন এক আত্মীয়-টাত্মীয় হবে।

সকালবেলা প্লেনে উঠে মনটাই ভালো হয়ে গেলো, এবারের পাইলট আর আগের মত না। কারণ, তার সব ইংলিশই বোঝা যাচ্ছে। একসময় নিরাপত্তাহীণ, নগ্ন দোহা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে উপরে উঠে গেলো বিমান, কিন্তু আমি তাকিয়ে থাকলাম নীচে। তাকিয়ে ভাবলাম, এই কিছুক্ষণ আগেও আমি যেখানে ছিলাম বর্তমান হয়ে, কিছুক্ষণ পরেই সেটা হয়ে গেল আমার অতীত। আপনা থেকেই নিজের মনে বলে উঠলাম, ‘ভালো থেকে দোহা, যুগ যুগ ধরে।’

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের বিমান ‘কাতার’ ছেড়ে ‘বাহরাইন’এর উপর চলে আসলো। নীচে খুব পরিষ্কার সব কিছু, সবই দেখা যাচ্ছে। একটার পর একটা দেশ আসছে। দেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেন অনুভূতিরও পরিবর্তন হতে থাকে। ‘সৌদি আরব’এর উপর দিয়ে যাবার সময় শুধু দেখা যায় বিস্তীর্ণ মরু আর মরু, আর চুলের মত সরু রাস্তার রেখা। মাঝে মাঝে বৃত্তাকার পুকুরের মত কিছু জিনিস দেখা যায়, ধারণা করবার চেষ্টা করলাম ওসব কি। বুঝতে পারলাম না। তেলকূপ হবে না কি কে জানে? মরুপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি ভাবতে থাকি, এ-মরুর বুকেই কি রচিত হয়েছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের যতসব ইতিহাস? কোথায় হয়েছে তাদের এই-সেই সব যুদ্ধ? কোথায় বাস করতো তাদের যত-সব বংশ-গোত্র? কোন পথে, কতদূর দিয়ে হাঁটতো আবু লাহাব, আবু তালিবরা। এ-পথ দিয়েই কি হেঁটে যায় আরব বেদুঈনের দল, যাদের ভালোবেসে বিশ্বকবি লিখেছিলেন, ‘তাহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুঈন, পায়ের নীচে বিশাল মরু দিগন্তে

বিলীন।' ঠিকমতো লাইনগুলো মনেও আসলো না। চলতে চলতে ইউরোপের দিকে চলে যাচ্ছে বিমান। ওদিকে, পাশে বসে থাকা শিখ ভদ্রলোক 'ওয়াইন' হাতে পেয়ে যেন স্বর্গের কাছাকাছি চলে গেলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার বউ চলে গেলেন নরকের কাছাকাছি। দেখার মত নাটক, কিন্তু সে-সব দেখার সময় কোথায়?

বিমানের সাথে যেন লুকোচুরিতে মেতে উঠেছে মেঘ। পাল্লা করে দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে। ছুটোছুটি করছে, যেন মেঘ আর বিমানের কত দিনের বন্ধুত্ব। দেখে মনে হচ্ছে মেঘেদের জীবন আছে এবং তারা স্বভাবে দুষ্টু প্রকৃতির। 'কালিদাস' তাহলে ভুল কিছু করেন নি? মেঘকে চাইলেই 'মেঘদূত' করা যেতে পারে নির্দ্বিধায়। মেঘ দেখতে দেখতেই নীচে হঠাৎ দেখি ভূমধ্যসাগরের তীর; মনে হলো একটা বড় সুইমিং পুল নীল রঙ ধরে রেখেছে। কিছু দূর যেতেই মেঘ গুলো আর নীচে দেখতে দিচ্ছেনা। তুলোর মত সাদা এই মেঘগুলো আবার ঋষির মত চুপ করে বসে আছে, একটার পাশে আরেকটা। যেন তার প্রেম করছে একে অপরের হৃদয় ছুঁয়ে। এ-যেন অন্য জগৎ, মেঘদের জগৎ, তাদের দেশ।

মেঘের উপর দিয়ে শক্তিমান সূর্য তার আলো পাঠিয়ে দিচ্ছে বিমানের জানালায়। সব জানালা বন্ধ করতে বলা হলো। কিন্তু এ-দৃশ্য রেখে জানালা বন্ধ রাখবো সে-মানুষতো আমি নই। বিমানের দেয়া ব্ল্যাঙ্কেটে জানালা আর নিজের মুখ জড়িয়ে অন্ধকার করলাম, তারপর তাকিয়ে থাকলাম পৃথিবীর দিকে। ভাবলাম, কী অপূর্ব এই বসুন্ধরা! 'তুরস্ক'এর উপর দিয়ে যাবার সময় মনে হলো 'কামাল আতাতুর্ক' কে ডেকে বলি, 'তুমি কি করো ঘুমিয়ে থেকে, দেখ! আমি যাচ্ছি তোমার প্রিয় স্বপ্নদেশের উপর দিয়ে। আমায় অভ্যর্থনা জানাও।' সারি সারি পাহাড় নীচে। উঁচু পাহাড়চূড়ো আসলে মনে হয় তারা খুব কাছে, ছুঁয়ে ফেলা যাবে। মনে হয়, এই চূড়োয় বসলেতো পুরো শহরটাকে দেখা যাবে, দেখা যাবে কে কি করছে। মনে হলো, 'অলিম্পাস'এর চূড়োয় বসলে সবাই 'জিউস' হতে পারে, সে আর এমন কি? মনে হলো তখন আমি 'জিউস'। নীচ থেকে কোন গাড়ীর কাচে প্রতিফলিত হয়ে আলোকরশ্মি ছুটে আসে। ওরা কি দেখছে আমাদের? দেখছে কি আকাশ দিয়ে একটা বিমান যাচ্ছে? কোন ছোট্ট শিশুকে তার মা কি বলছে, 'দেখো, দেখো, আকাশ দিয়ে বিমান যায়, একদিন তুমিও এরকম বিমানের পাইলট হবে।'-যেমন করে আমার মা ছোটবেলায় আমাকে বলতো।

এইসব দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল হয়নি। কেটে গেছে বেশ কিছু ঘণ্টা। কিছুক্ষণের মধ্যে পাইলট অবতরণ করতে যাচ্ছে। কিছু কাগজপত্র পূরণ করতে হলো। অনেক নীচে নেমে গেছে বিমান। নীচের সব বাড়ীঘর দেখতে পেলাম, খুব গোছানো, সাজানো। অবতরণের পর বিমানবন্দরের গাড়ী এসে আমাদের নিয়ে গেলো ইমিগ্রেশানের দিকে।

গাড়ী হতে নামতে না নামতেই সূর্যের আলো এসে পড়লো চোখে। অস্তগামী সূর্য। খানিকটা পরই হয়তো রক্তিম হয়ে যাবে। দুপুরবেলার শক্তিমান-পরাক্রমশালী-তেজী সূর্য, বিকেলে এসেই ম্লান হয়ে পড়ে; পরাজিত

হয়, পরাভূত হয়। পরাজয়ের গ্লানি ঢাকতে পারেনা দেখেই হয়তো লজ্জায় লাল হয়ে যায়। লাল হয়ে ঘোষণা করে তার নিভে যাওয়ার বার্তা, নিঃশেষ হয়ে যাবার বার্তা। একটু পরেই তার সমস্ত অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাবে দিগন্তের সীমানায়। অস্তগামী, পরাজিত, লজ্জাতুর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে সামনে এগোতে থাকি। ঠিক সে-মুহূর্তে আমার চোখের উপর সেই ম্রিয়মান সূর্য, আর পায়ের নীচে 'যুক্তরাষ্ট্র', পদদলিত 'ইউনাইটেড স্টেটস্ অব অ্যামেরিকা'। (চলবে...)

পরশপাথর
অক্টোবার ১১, ২০০৯
Poroshpathor81@yahoo.com